ভরসার ভার

ডাঃ মখদুম আজম মাশরাফী

সাম্প্রতিক কালে দেশের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় রাজনৈতিক দিকচিহ্নহীনতা। বাংলাদেশের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাবহুল রাজনৈতিক অতীত দেশবাসীকে স্থাপন করেছে এক সক্রিয় গতিশীল চিন্তা বিলোড়নে। কারণ দেশবাসী অবিরাম অতিক্রম করে চলেছে দ্বন্দবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জীবন প্রক্রিয়া। উপনিবেশ, প্রশাসন ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম জনগনকে সক্রিয় রেখেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। পৃথিবীর যেকোন জাতির মুক্তিসংগ্রামের মত এদেশের সংগ্রামের পর্য্যায়গুলি সর্বস্তরের মানুষের জীবনকে আন্দোলিত করেছে তুমুলভাবে।

চল্লিশের দশকে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে আত্মঘাত উগ্রমূর্ত্তিতে ধেয়ে যায় পুরো ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। সর্বস্বঃহারা মানুষ ভিটে মাটি ছেড়ে অজানা বসতির উদ্দেশ্যে সীমান্ত পেরোয়। পেছনে ফেলে যায় দাঙ্গায় নিহত প্রিয়জনদের আর জীবনের সুখকর স্মৃতিগুচ্ছকে। এই অপূরণীয় বিপর্য্যয়ের ক্ষত বুকে করে তথাকথিত রাজনৈতিক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাধারণ মানুষ থাকে সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসী।

সাধারণ জনগনের আত্মত্যাগ, বিসর্জন, শ্রম, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বিপরীতে মেলে প্রবঞ্চনা, শঠতা ও স্বপ্নভঙ্গ। যে নেতৃত্বের ভরসায় এই সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগ তা ধুলিলুণ্ঠিত ও বিলীন হয়ে যায়। সন্তানের রক্তেভেজা রাজপথ থেকে শুরু যে স্বপ্নভঙ্গের হানাদার সামরিক অভিযানে অসহায় দেশবাসীর বাধ্যকৃত প্রতিরোধের গ্যারিলাযুদ্ধের প্রান্তরে এসে ঠেকে তার পরিণতি।জেল, জুলুম, অনাচার, অত্যাচার জুড়ে থাকে আড়াই দশকের দুঃস্বপ্নের পটভূমি। কেউ কি কখনও দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিল যে নেতৃত্বের জন্যে প্রাণপাত, জন্মভূমি ত্যাগের মতো বিপুল বিসর্জনের বিপরীতে মিলবে সেই নেতৃত্বের বন্দুক থেকে গুলি আর মধ্যরাতে দেশজুড়ে গনহত্যার নারকীয় তান্ডব!

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোন আকাশচুম্বি উচ্চাকাঙ্খা নেই। ভোগবাদী পশ্চিম পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এ ভুখন্ডের মানুষের জীবনবোধ। অতিসাধারণ দু'মুঠো ভাত, মোটা কাপড় আর একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেই সুখের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় এদের জীবনে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের গবেষনায় সম্প্রতি এবং এর আগেও এ সত্যই বহুবার প্রমানিত হয়েছে যে, দরীদ্রতম দেশবাসী হয়েও পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী জনগোষ্টি হল বাংলাদেশের মানুষ।

ষাট ও সত্তুরের দশকে শেষপ্রান্তে সে সুখের স্বপ্নে বুক বাঁধে দেশবাসী আরেকবার। এবারে ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রদর্শন আর নির্দেশে আবারও বাংলার মানুষ রচনা করে এক অপ্রতিরোধ্য অভিযান। নেতাকে বিশ্বাস ও আস্হায় নামাজে-রোজায়, পূজায়-প্রার্থনায় করে তোলে দেবতূল্য। প্রশ্নহীন আস্থা ও সম্মানবোধে পালন করে নেতার নির্দেশ। নেতা হয়ে ওঠে অবিসংবাদিত পরমপুরুষ অথবা পূজ্য প্রতিমা। দু'দশকের আন্দোলনের দোলাচলে 'ধ্যানের ছবি পাকিস্তান' হয়ে ওঠে স্বপ্নভঙ্গের আর দুঃস্বপ্নের প্রতিচ্ছবি।

ছাত্র, জনতা, কুলি, মজুর, কর্মচারী, শিল্পী, লেখক সবার জীবনে এই সব আন্দোলন আনে প্রচন্ড ঝাকুনী। সংগ্রামের একের পর আরেক পর্য্যায় ঝড়ো সমুদ্রের উর্মীমালার মত দুলিয়ে দেয় দেশ। জনগনের সামগ্রিক শক্তি অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যায় নেতাকেও। যেন প্লাবনের প্রবল প্রবাহে আন্দোলন তুঙ্গে তুলে আছড়ে দেয় নেতাকে। সুক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে জনতার স্বতস্পুর্ত অংশগ্রহন ছিল, সময়োচিত, যথাযথ, নির্ভুল ও সাফল্যমন্ডিত। ৫২, ৫৪, ৬২, ৬৪, ৬৯, ৭১ সবকটি মাইলফলকে জনতার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। ৭১ এ মুজিবহীন, ভাষানীহীন বাংলাদেশ যুগপৎ আন্দোলন ও রনাঙ্গনে নতজানু হতে বাধ্য করেছে হানাদার বাহিনীকে। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গকারী ও বিশ্বাসহন্তা নেতা ও নেতৃত্বরা বারংবার ব্যর্থ করেছে জনতাকে। প্রাণ ও রক্তমূল্যে অর্জিত সাফল্যকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে বিকশিত করে তোলার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক শক্তিহীনতাই নিঃসন্দেহে এসব ব্যর্থতাকে ডেকে আনে।

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবেশে জাতিকে শুধু দ্বিধাবিভক্তই মনে হয়না বরং রাজনৈতিক শূন্যতাকে ভয়ংকর বলে মনে হয়। গেল বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে দেশে প্রত্যক্ষ করেছি এ নিয়ে মানুষের দুঃশ্চিন্তা ও শংকা। এই শংকাকে উন্মাদ সন্ত্রাস দিয়েছে নতুন মাত্রা। মাঠে, মিডিয়ায়, পত্রিকায়, সংলাপে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে উত্তেজনা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন, তাতে দেশকে সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন মনে হয়েছে। জে, এম, বি, নামের সংগঠনের আত্মঘাতি কিশোরদের উদ্যোগ পদ্ধতি, আচরণ ও বক্তব্য জাতির রাজনৈতিক দিকচিহ্নহীনতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এই বেপথু কিশোররা প্রায় সবাই দরিদ্র ঘরের সন্তান। নিঃসন্দেহে এদের জন্ম রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিবেশ থেকে এ কথা বুঝতে হবে। এদের ছবি কাগজে , টিভিতে দেখে আমার নিজ কৈশোরবেলার মুক্তিযোদ্ধা জীবনের স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। সে বয়েসের অপরিণত-আবেগমন্ডিত মন দেশ, জাতি, সত্য, ন্যায়, দমনবাদ, এইসব যাদুকরী রোমান্টিক শব্দে আপ্লুত হয়ে আত্মদানে প্রস্তুত হয়ে যায়। কখনও অর্থনৈতিক সুবিধার বিপরীতে দারীদ্র পীড়িত তরুণ সমর্পন করে আবেগের কাছে। যারা এদের মগজে বিষ ছড়ায় বর্তমান রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিবেশ তাদের জন্য প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। অথচ ক্ষমতা-লোলুপ, নেশাগ্রস্থ তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো সুবিধা মাফিক দুই 'গোত্রে' সমবেত হয়ে মসনদ দখলের আপ্রান নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা করে চলেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেকোন একটি 'গোত্রে' এমন পরস্পর বিরোধী কতগুলো দল আছে যে নীতি ও লক্ষ্যকে বিসর্জন দিয়ে এরা শুধু ক্ষমতার ভাগ আস্বাদনের জন্য জনবন্ধু সেজেছে।

আজকাল ১৪ দল জোট সরকারের ধর্মভিত্তিক দলটিকে রাজাকার বলে দাবী করছেন অহরহ। অথচ নিকট অতীতে বর্তমান সরকারেরও আগে নিজেরাই সেই দলটির সাথে রাজনৈতিক আঁতাতের আলোচনা বৈঠক করেছিলেন। কথা আছে রাজনীতিতে চিরশত্রু বা চিরবন্ধু বলে কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে এমন 'শত্রুর' সাথে আঁতাত করতে হবে? জাতির এই দেউলিয়াপনার জন্যে যারা দায়ী তারা কখনই আয়নায় মুখ দেখেন বলে মনে হয় না। মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ী জাতি সেই নেতৃত্বের হাতেই অর্পন করেছিল ভার। সে ভার বহনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা তাদের কতটুকু ছিল সে কথা সবারই জানা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালের দুঃশাসনের ইতিহাস দেশবাসী ভুলে যাওয়ার কথা নয়। মূল্যবোধ ও সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর ভিত যে কি ভাবে, কত দ্রুত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সেই উন্মাদ সময়কাল। সে কথা বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করি না।

যে ঐতিহাসিক রেসকোর্সের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতিকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্দেশ, সেই একই রেসকোর্স মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পত্মেই নেতা বলেছিলেন "তিন বছর কিছু দিতে পারবো না।" জনতা সশ্রদ্ধ চিত্তে তা মেনে নিয়েছিলেন। কোন পক্ষ থেকেই কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি। তারপর ইতিহাস সাক্ষী প্রতিপক্ষকে কি নিষ্ঠুর হাতে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। 'বি টিম' নামে পরিচিত যে দলটি গণতন্ত্র উত্তরণ প্রক্রিয়া এবং দেশ গড়ার স্বার্থে অন্ধ অনুচরের মত অনুসরণ করত নেতাকে এমনকি তাদের উত্থাপিত সামান্য প্রশ্নও সহ্য করা হয়নি। বাংলার পুলিশ প্রথম গুলি করে হত্যা করে বাংলার ছেলেদের। পিটিয়ে তাদের অফিসে আগুন দিয়ে তান্ডব রচনা করে শক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল সেদিন গুলিতে। নিজ দলের আভ্যন্তরীন প্রশ্নকারীদের গুরুভারে স্তব্ধ করে দেয়ার পক্ষপাতদুষ্ট পদক্ষেপ থেকে জন্ম নেয় তৎকালীন 'জাসদ' নামক ফ্রাংকেনস্টাইন। গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণপন মানুষ স্তব্ধ বিস্ময়ে অবলোকন করেন বিশ্বাস ভঙ্গের আরেক অধ্যায়। হতবাক জনতা প্রত্যক্ষ করেন গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার, দুঃশাসন আর অবস্থিত সমাজব্যবস্থার প্রতিশ্রুত পূণর্বিন্যাসের পরিবর্তে, তাকে চুর্ণ করে দেয়ার উন্মাদ উত্তেজনা।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ। আড়াই দশকের বৈষম্যের অবশেষ আর যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশ। সিভিল সার্ভিস সহ সম্পূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামোর দৈন্য দশা। সামরিক বাহিনীর কাঠামো, বৈদেশিক বানিজ্যের কাঠামো, পি. আই. এ বিমান বহর, বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ শূণ্য, ভগ্ন ও বিশৃঙ্খল অবস্থা যা পূণর্গঠন ও পূণর্বিন্যাস একটি জাতির প্রধান কাজ। যথাযথ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ছাড়াই তড়িঘড়ি করে, অযথার্থ প্রতিযোগিতা করে মেজর রা হয়ে যান মেজর জেনারেল, সেকশন অফিসাররা হয়ে যান সেক্রেটারী। অন্যদিকে অপ্রস্তুত, অপরিপক্ক সাংসদরা নেন জাতির দায়িত্বভার। এমপিএ (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, মেম্বার অব প্রভিনশিয়াল এসেম্বিলি), এবং এম,এন,এ(জাতিয় পরিষদ সদস্য, মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেম্বিলি) এরা হয়ে যান এম,সি,এ (সাংবিধানিক পরিষদ সদস্য, মেম্বার অব কনিষ্টিটিউশনাল এসেম্বিলি)। মানে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা হঠাৎ হয়ে যান সংবিধান রচনার দায়িত্ব প্রাপ্ত

জাতীয় সংসদ সদস্য। এই পরিব্যপ্ত বিবমিষার পরিস্থিতিতে সংযুক্ত হয় জাতিয় সর্বক্ষেত্রে অযোগ্যদের হাতে গুরুদায়িত্ব অর্পনের প্রতিযোগিতা।

অতিদ্রুত সংবিধান রচনার জন্যে পড়শীর ভাগাড়ে অন্বেষনে যান আইনমন্ত্রী। প্রধান নেতার অনুপস্থিতিতে যে সাথী নেতারা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন, পরিচালনা, প্রবাসী সরকার গঠন, আন্ত র্জাতিক সমর্থন আদায় করেছিলেন, দেশ গঠনের কঠিন সময়ে তারা অপসারিত হয়েছিলেন। রহস্যজনক কারনে তারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিলেন দলের স্বাধীনতা বিপক্ষের সাথী নেতাদের দ্বারা। জাতীয় ঐ সব অপরিহার্য্য অবকাঠামো পূনর্গঠনের পরিবর্তে আয়াসী ও অনর্থক আত্মতৃপ্তির অহংকারে লিপ্ত হন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। সাধারণ জনগনের সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর গ্যারিলাযুদ্ধের আর মিত্রবাহিনীর সুদক্ষ 'ব্যাক আপ' এ যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তার উল্লাস হয়ে ওঠে এদের উন্মত্ত, নিষ্ঠুর আর দায়িত্বজ্ঞানহীন আত্মপ্রসাদের উৎসব। নেতা যথার্থই বলেছিলেন 'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন কাজ।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'চাটার দল আমাকে ঘিরে রেখেছে' । অথচ তখন প্রয়োজন ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে কঠোর জাতীয় পূনর্গঠনে দিবা রাত্র কর্মযজ্ঞ ও সাধনা। ইতিহাসের উপহাস হলো চাটার দলের দুষ্কর্মের জন্যে নেতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে জীবন দিতে হয়েছে কিন্তু সেই চাটার দল এখনও টিকে আছে।

সে সময় মোজাফ্ফর ও মনিসিংহের 'এসো দেশ গড়ি'র কোন ধারনাই স্পর্শ করতে পারে নি ক্ষমতাসীন দলকে। অকারন অহংকারের দুর্বোধ্য উল্লাসের ভাবাবেগে নিভৃতে পড়ে থাকে পূনর্গঠনের ভাবনা ও উদ্যোগ। রক্ত ও অশ্রুতে অর্জিত জাতির যাত্রা শুরু হয় এক অন্ধ দৈত্যের মত। প্রতিবাদী কিংবা সমালোচকদের প্রতি লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেয়ার হুংকার আসে সেই একই রেসকোর্স মঞ্চ থেকে। ব্যর্থতার যন্ত্রনায় পরে কাতরে ওঠেন নেতা। পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়ে নেতা হুংকার ছেড়ে বলেন-'কোথায় সিরাজ সিকদার?' সমাজবিজ্ঞানের অনিবার্য্য ফলশ্রুতিতে এই দমননীতি ও সন্ত্রাসের জন্ম দেয় গোপন সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির রোমান্টিক চর্চা। এ যেনো বাংলার সদা মুক্তিপিপাসু মানুষের বাঁধ ভাঙ্গা সর্বনাশা জোয়ার। সর্বহারা, গনবাহিনী, আত্মাই এর গনযুদ্ধ ইত্যাদি গনবিচ্ছিন্ন মঞ্চে সমবেত হন দেশের শ্রেষ্ট তরুণ সন্ত ানেরা। উদ্ধত দমন অভিযানে 'রক্ষীদের' হাতে প্রায় ৬২ হাজার তরুণ পতঙ্গের মতো অনর্থক আত্মাহুতি দেন। আত্মাহুতি সম্পন্ন হলে ৫৪ পৃষ্ঠার আত্মস্বীকৃতি পুস্তিকায় ঐ দলের 'দাদা' ঐ আন্দোলনকে তাদের নিজেদের ভুল বলে বর্ণনা করে হাত ধুয়ে নেন। আরেক 'প্রখ্যাত' প্রবীন নেতা 'গলা কাটার রাজনীতি করে ভুল করেছি' বলে হাত ধুয়ে আবার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পান। বাংলার ইতিহাসে দেশের ত্যাগি ও উজ্জ্বল তরুণদের প্রাণের এমন অপচয় আর নিকট অতীতে নেই।

এই নিষ্ঠুর অবদমনের পরিবেশে ধর্মোন্মাদ স্বাধীনতা বিরোধী একটি কোটারী পবিত্র ধর্মের নামে পূনর্গঠিত করে তোলে '৭১ এর বিভিষিকাময় সেই ভ্রান্ত রাজনীতি। একদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারহীন সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা অন্যদিকে নিরাপরাধ ধর্মপ্রাণ রাজনীতির অধিকারকে বেআইনী ঘোষনা সৃষ্টি করে এক বিমুঢ় পরিস্থিতি। উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ত্যাগকারীদের সেই

ঐতিহাসিক আকাঙ্খাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমদানী করা হয় ভিন্ন ধারণা যা জনগনকে তাদের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন জোর করে পৃথক করতে বাধ্য করে। অথচ যে প্রতিবেশী দেশের সংবিধানের ছায়ায় প্রণিত হয় আমাদের ধর্ম উদার সংবিধান, সে দেশেও ধর্মদর্শনমূলক রাজনীতি নিষিদ্ধ নয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় হলো 'গোত্র' ভুক্ত দলগুলি কিন্তু প্রতিদিনের চিন্তা চেতনায়, আচরণে-ভাষনে প্রধানতঃ অতীতচর্চায় নিমগ্ন থাকেন। নেতা প্রদত্ত 'সাধারণ ক্ষমা' র রাজনৈতিক ধারণার মূল তত্ব না বুঝেই অনবরত 'স্বাধীনতা পক্ষ' ও 'স্বাধীনতা বিপক্ষ' এই শিরোনামে জাতিকে ক্রমাগত বিভক্ত করতে থাকেন। এ বোধ করি দলের আভ্যান্তরিন গনতন্ত্র ও সংলাপ ছাড়াই এক নেতার একক সিদ্ধান্তের কারণে দলীয় কর্মী ও অন্যান্য নেতারা এ বিষয়ে অন্ধকারেই থেকে গেছেন। এরা তাই প্রতিদিনের উচ্চারনে প্রতিপক্ষকে 'ওরা রাজাকার' 'ওরা আলবদর' বলে বিষোদগার করতে থাকেন। আর শত অগনতান্ত্রিক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, দমনমূলক আচরনের প্রবল চর্চা করেও নিজেদের 'স্বাধীনতা পক্ষের' শক্তিবলে দাবী করতে থাকেন। নেতার সেই অপরিনতকালীয় সাধারণ ক্ষমার এই দ্বিমুখী প্রয়োগের অনিবার্য্য ফলাফল আজকের জে,এম,বি এর জাতীয় উন্মাদ রাজনীতির উত্থান।আজকের নেতারা কিন্তু তা কিছুতেই মানতে চাইবেন না।

এবারে সাধারণ ক্ষমার বৈশ্বিক প্রয়োগের ব্যপার লক্ষ্য করা যাক। ভিয়েতনাম সুদীর্ঘ ১৩ বছর যুদ্ধ করে পৃথিবীর বখাটে মার্কিনীদের পরাজিত করে অর্জন করেছেন জনগনের কাঙ্খিত মুক্তি ও জাতিয় গৌরব। দেশীয় যারা মার্কিনীদের দোসর ছিলেন, গণযুদ্ধের সশস্ত্র বিরোধী ছিলেন, তাদের ওরা শত্রু বলে আখ্যা দেননি বিজয় অর্জিত দেশে। যাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অপরাধের প্রমান মিলেছে প্রচলিত ও আন্তর্জাতিক আইনে শাস্তি দেয়া হয়েছে। তারপর তাদের সাত বছর ধরে 'রি এজুকেশন' প্রোগ্রামে ক্যাম্পে পূর্ণশিক্ষিত করে মূল ধারার জনগনের সাথে সতর্কতার সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তারা জাতি পূনর্গঠনে স্ব স্ব দক্ষতা অনুযায়ী অবদান রাখতে পারেন। তাই বিশ্ববানিজ্যে ভিয়েৎনাম দীর্ঘ তের বছরের যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে বেরিয়ে দ্রুত সামিল হতে পেরেছে এশিয়ার শিল্প ও বানিজ্যবিপ্লবের মিছিলে।

অন্যদিকে দক্ষিন আফ্রিকার প্রবাদ পুরুষ ২৭ বছর কারাগারে কাটিয়ে মুক্তির পর ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট হয়ে তার এবং তার কৃষ্ণকায় জনগনের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ট শ্বেতকায়দের অমানবিক অবিচার, অত্যাচার ও অন্যায় আচরনের জন্য প্রতিশোধমূলক কোন উচ্চারণ করেন নি। 'ট্রুথ এন্ড রিকনসিলিয়েশন' কমিশন গঠন করে অপরাধী ও ভুক্তভোগীদের ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের মুখোমুখি এনে অপরাধের স্বীকরোক্তি নেয়া হয়েছে এবং তা প্রকাশ্য জনসমাবেশে মিডিয়ায় প্রচার ও রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু 'এপার্থেইড' বা শাদাকালোর ধারনার যে বৈষম্যের রাজনীতি এতকাল এই অত্যাচার চালিয়েছে তা প্রতিশোধ স্পৃহায় বিভক্ত না করে বরং তিনি ঐক্যবদ্ধ জাতির লক্ষ্য স্থির করেছেন। অথচ বাংলাদেশ প্রধানতঃ একভাষা, এক জাতি ও এক ধর্মের দেশ।

কিন্তু বাংলাদেশে নেতার 'সাধারণ ক্ষমায়' সে ধরনের ঐক্যবদ্ধজাতির চিন্তা ছিল কিনা তা আরেক বিষয়। এই ঢালাও সাধারণ ক্ষমার পেছনে নানান কারনের গুজব প্রচলিত আছে। ইতিহাসের গবেষকরা তার উত্তর খুঁজে বের করবেন হয়তো একদিন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধপরাধ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, ধর্ষণ ইত্যাদির বিচারের ভার আন্তর্জাতিক আদালতের আন্ত র্জাতিক গনহত্যা আইনে। যথাযথ শ্রদ্ধা রেখে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত একজন রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করতে পারেন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

'৭৫ গনঅসন্তোষের সুযোগে একদল হঠকারী অর্বাচীন জুনিয়র সৈনিকদের হাতে নেতার স্বপরিবার নিধন আপাততঃ চোখে পরিকল্পিত মনে না হলেও, সুগভীর ষড়যন্ত্রের ফলাফল বলে ধারনা করার বহু কারণ আছে। এ ভাবে ব্যরাকের সৈনিকেরা হস্তক্ষেপ করেন রাজনীতিতে। তারা গনতন্ত্র রক্ষার নামে স্বৈর-গনতন্ত্রী নেতাদের উচ্ছেদ করে, মসনদ দখল করে বসেন। কয়েক দফায় ক্ষমতার কাড়াকাড়ি চলে। প্রধান বিচারপতিরা বন্দুককে বৈধ করতে আসেন আর যান। এবারে শুরু হয় সংবিধান ব্যবচ্ছেদের পালা। উন্মুক্ত গনতন্ত্রের নামে যুদ্ধাপরাধীদের পূনর্বাসিত করার প্রক্রিয়াকে আইনানুগ করা হয়। দু 'গোত্রের' শক্তি ভারসাম্য সৃষ্টির জন্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বার্থকে গৌন করে ফেলা হয়। বাঙ্গালী বনাম বাংলাদেশী বিতর্ক তুলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্মযজ্ঞের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া হয়। এসবই করা হয় জনগনের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করে, বিরোধীপক্ষকে ক্ষমতা থেকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। এ প্রক্রিয়ায় আসে প্রায় ১৫ টিরও বেশী ক্যূ ও পাল্টা ক্যূ। কিন্তু শেষ রক্ষা অসম্ভব হলে ক্যূ তে প্রাণ দিতে হয় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল সহ স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে। এ যেন মঞ্চে রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর জনতার দর্শকের সারিতে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় অবলোকন করা।

পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ইতিহাস সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। যেন ইতিহাস হলো বায়বিয় পদার্থ। নতুন প্রজন্ম কিছুতেই ভেবে পায়না সত্য কিভাবে বার বার বদলাতে পারে। বিপুল পরিমান জনগনের অর্থের অপচয় হয় বই বদলাতে আর অফিসে আদালতে রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি বদলে যখনই সরকারে পালা বদল হয়। রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি টাঙ্গানোর রেয়াজ অন্য কোন উন্নত গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আছে কিনা সন্দেহ।আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আরেকটি বিষয় হলো রাজতন্ত্রের বা উপনিবেশিক শাসনের প্রভাব এখনও মন-মানসিকতায় পুরোদমে বিদ্যমান। নেতাদের জন্যে তোরন, মালা, ছবির ব্যবহার এর একটি দিক। আরেকটি দিক হলো নেতার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের পদলেহী প্রবনতা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই আচরণ গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী হলেও এখনও তা অনিবার্য্য অংশ।নেতারাও যে এই সামন্ত-মানসিকতার লালক তার প্রমান পাওয়া যায় তাদের আচরণে ও উক্তিতে।

আজ স্বাধীনতা পরবর্তী ৩৫ বছর পর পেছনে ফিরে তাকালে গভীর ভাবে হতাশ হতে হয়। জনগনের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়নের পরিবর্তে অবনতি হয়েছে। কর্ম সংস্থান, শিল্পোদ্যোগে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক পেছনে। জাতীয় দারিদ্র, কিংবা

বিপুল জনসংখ্যা আর কোন ওজোর নয় এ যুগে। ভারত, চীনের আছে সুবিশাল জনশক্তি, তারা তাকে কাজে লাগিয়েছে সাফল্যের সাথে। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া পশ্চিমা বিশ্বের জন্যে কর্মী হাতের উৎস হয়ে উঠেছে। একদিকে আমাদের নেই সুস্পষ্ট নীতিমালা, অন্যদিকে ক্ষমতালোভী, অদেশপ্রেমিক অনেক রাজনীতিবিদ হরতাল, বিক্ষোভ ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন করে শিল্প বানিজ্যে সৃষ্টি করে চলেছে হতাশা ও বিপুল ক্ষতি।কর্মক্ষেত্রে, অবহেলা, অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতির ও দীর্ঘসূত্রিতার রোগ কুরে খাচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে। এখনও দক্ষ ও সুশৃঙ্খল আমলা তৈরীর কোন রাজনৈতিক উদ্যোগ নেই। বরং রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট অদক্ষ আমলারা দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতার পথে জগদ্দল পাথরের মত বাঁধার সৃষ্টি করে বসে আছে।দুর্নীতির দক্ষতায় আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের শীর্ষস্থান অধিকারের লজ্জা একাধিকবার। বর্তমান দেউলিয়াপনার পরিবেশে বুদ্ধিজীবিরা হতাশ ও শংকিত। যেমন গ্রামীন অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত বেসরকারী সাফল্যের আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জনকারী অধ্যাপক সম্প্রতি দেশীয় রাজনীতির প্রতি হতাশা ব্যক্ত করেছেন তার মন্তব্যে।

জাতির এটি একটি মহাসংকটকাল। দেশের মালিকানা কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর নয়। দেশের সংকটকালে জনসাধারনকে যেমন মূল্য দিতে হয়, দায়িত্ব নিতে হয়, রুখে দাড়াতে হয়, আজও তেমনি প্রয়োজন প্রকৃত রাজনীতিক ও অরাজনৈতিক দেশপ্রেমিকদের সক্রিয় ভাবে এ সংকটের সমাধান খোঁজা। শিক্ষাহীন দরীদ্র দেশপ্রেমী মানুষ ভরসা করে আছেন শিক্ষিতের দিকেই।এই মহাশূণ্যতার প্রাক্কালে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের এগিয়ে আসতে হবে জনগনের আস্থার ভার নিজ কাঁধে গ্রহন করবার প্রত্যয় ও দক্ষতা নিয়ে। সাহসী, মেধাবী, এই শিক্ষিত কর্মীবাহিনীকে নিতে হবে রাজনৈতিক দায়িত্বভার। কারণ রাজনীতিকরাই পরিশেষে দেশ পরিচালনা করবেন সুস্থ্য ও সফল গনতান্ত্রিক সভ্য ব্যবস্থায়। প্রচলিত সংসদ বর্জনকারী, গনতন্ত্র বিরোধী, হরতালকারীদের বিপরীতে সংসদমুখী, গনসংযুক্ত, কর্মচঞ্চল প্রতিনিধিদল সৃষ্টি করতে হবে। দেশ-বিদেশের সকল গনতান্ত্রিক ব্যক্তিদের প্রশিক্ষক হিসেবে অবদান রাখতে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। বাক্-স্বাধীনতার দেশ বাংলাদেশের মিডিয়াগুলো দেশের দেশপ্রেমী বুদ্ধিজীবি ও বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে গনসংলাপ ধরনের চিন্তা-বিলোড়নের উদ্যোগ।

বাংলার মানুষ দেশ ও স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু প্রহরীই দেশের সার্বভৌমত্বের শেষ কথা নয়। সফল ও বিকশিত একটি জাতিই দিতে পারে জনগনের সর্বোচ্চ উন্নত জীবনের গ্যারান্টি। আর তার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্যে চাই সততা-উদ্বুদ্ধ কর্মীবাহিনী, উদ্যোগ ও কর্মসূচী।গনতন্ত্র আমাদের গর্ব। কিন্তু রাজনীতি মৌলিক দেশ ভাবনায় বিভক্ত হয়ে সম্পূর্ণ দুই মেরুতে অবস্থান নিলে গনতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশবাসী হয়ে পড়ে তার অসহায় শিকার। এখন যেমনটা হয়েছে। তাই পরমতসহিষ্ণু, সভ্য-আচরিত ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্বাবোধের উদ্বোধন দরকার। রাজনৈতিক নীতিভিন্নতা গনতান্ত্রিক চর্চার মেধাবিকাশের ধারায় প্রবাহিত হতে দিতে হবে। প্রবল পেশী বিরুদ্ধতা গনতন্ত্রের বিরোধী উপাদান এ কথা বুঝতে হবে।

উপনিবেশিক শাসন, সামরিক গনতন্ত্র ব্যবস্থা সবই ছিল বিদেশী প্রভুদের দখলদারী মানসিকতার রাজনীতি। যে ধারাবাহিক সংগ্রামে তাদের আমরা দেশছাড়া করেছি আজকের রাজনীতির ধারা সে মাত্রায় চলতে অচল। বর্তমান দেশ, বিদেশী শাসিত নয়, স্বাধীকারের রাজনীতি অনেক বেশী দায়িত্বের। এই স্বদেশী রাজনীতিতে ব্যর্থতা মানে বিদেশী প্রভুদের আবার নিমন্ত্রন করা। জে, এম, বি তাই করছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরম্পরা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে দেশবাসীর ক্রিয়াকলাপ ও চেতনা একটি সুখী গনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও লালন চায়। যে নেতৃত্ব দেশবাসীর সেই সক্রিয় সংকল্পকে রুপায়িত করতে পারবেন দেশবাসী তাদেরই ওপর অর্পন করবেন পবিত্র দায়িত্বভার।

ডাঃ মখদুম আজম মাশরাফী, এডেলেইড, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬